ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১৬৯-১৯৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4310

মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ সংবাদপত্রের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা

ড. এ. এস. এম. মোহসীন
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: In 1971, British frontline newspapers were crucial in influencing global public opinion against the massacre, violence, and acts against humanity committed by the Pakistani army. The majority of the newspapers advocated for peaceful political accommodation and opposed the killings. The foreign journalists tried to report on the atrocities using their own source and diplomatic channel, despite being kicked out of the Hotel Intercontinental by the Pakistani government on March 26, 1971. For example, on March 26 and 27, 1971, Michael Laurant of the Associated Press and British journalist Simon Dring surreptitiously remained in Dhaka and monitored the situation. Later, British journalists, including Peter Hazelhurst of *Times* and Colin Smith of the *Observer* crossed the border into Bangladesh. Numerous eyewitness accounts and interviews about the murders and atrocities committed against the Bengalis were published by British newspapers based on their information.

Key Words: Newspapers, Britain, Liberation War, Killings, Atrocities.

১. ভূমিকা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও মানবতাবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনে ব্রিটেনের প্রথম সারির সংবাদপত্রসমূহ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। এটি সবসময় সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি গঠনমূলক। ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশ সংকটের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান এবং ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিশেষ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাঙালি শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান, কলেরা টিকার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ– প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্রিটেন বাংলাদেশ সংকটে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এর একটি প্রভাব ব্রিটিশ গণমাধ্যমেও প্রতিফলিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত গণহত্যা, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধুর অবস্থান প্রভৃতি বিষয় ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে বাংলাদশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ২৫ মার্চের কাল রাত

ও স্বাধীনতা ঘোষণা, গণহত্যা ও নির্যাতন, শরণার্থী সমস্যা ও মানবিক সহায়তা, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও বিচার, ব্রিটেনসহ বহির্বিশ্বের ভূমিকা, সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকার ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ধারাবাহিকতা ও কালানুক্রম বজায় রাখা হয়েছে।

২. মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্রিটিশ নীতি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা ছিলো অনেক বেশি গঠনমূলক। পাকিস্তান কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের জন্য আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালের জুন মাসের নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি জয়ী হয় এবং এডওয়ার্ড হিথ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর প্রায় ছয় মাস পর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। এসময় থেকেই পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল এবং সামরিকবাহিনী যে ভূমিকা পালন করে তা ঢাকা, দিল্লি ও রাওয়ালপিন্ডিতে ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে লন্ডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিব স্যার আলেক ডগলাস হিউমের কাছে প্রেরিত হতো। এসব প্রতিবেদনে একাধিকবার পাকিস্তানের ঐক্য বিনষ্ট হওয়া এবং সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। ২৫ মার্চের পর ব্রিটিশ কাউন্সিল আক্রান্ত হয় এবং কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক পাকিস্তানি বাহিনীর হেনস্তার শিকার হন।[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে হিউম কমনস সভায় ২৯ মার্চ মন্তব্য করেন: “we have no intention of getting involved in this matter, which is a civil matter for the authorities in Pakistan. As regards arms, no new contracts have been entered into with Pakistan for a good many months now.”[২] একই সময় ২৯ মার্চ ইসলামাবাদ থেকে লন্ডনে প্রেরিত বার্তায় উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির জীবনের প্রতি কোনো মমত্বই প্রদর্শন করেনি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছে।[৩] প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটেন জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, অযাচিত সহিংসতা এবং পাকিস্তানের অস্তিত্বের ক্ষতির বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানকে অনুরোধ করে। প্রধানমন্ত্রী হিথ এই আলোচনায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকা এবং জনসম্মুখে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা প্রদান করা সম্পর্কে নিশ্চিত করার পক্ষে অবস্থান নেন।[৪] একটি পর্যায়ে ব্রিটেন জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতা এবং শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন শুরু করার জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে। হিউম মে মাসে পুনরায় সামরিক অভিযান বন্ধ করার এবং আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থার মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে মত দেন।[৫] দেশটি এক্ষেত্রে পাকিস্তানে সব ধরনের বিদেশি সহায়তা বন্ধের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানকে বাংলাদেশ সংকটের একমাত্র স্থায়ী সমাধান হিসেবে উল্লেখ করে। বিষয়টি ইয়াহিয়া নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং কমনওয়েলথ থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুমকি দেন।[৬] ব্রিটেনের কাছে সামগ্রিক সংকট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ইস্যু হলেও দেশটি অনেকটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার পাকিস্তান নীতি গ্রহণ করে। দেশটির মতে এতগুলো মানুষের জীবন সংকটের কারণে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চিন্তার বিষয়। ফলে দেশটি প্রথম থেকেই

পাকিস্তানের হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ৭ এপ্রিল ইয়াহিয়াকে লেখা চিঠিতে দ্রুত রক্তপাত এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করার আহ্বান জানান।[৭]

বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া নিয়েও ব্রিটেনের অবস্থান ছিল পাকিস্তান বিরোধী। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলে সংকটের যে, কোনো সমাধান হবে না সেটি ব্রিটেন পাকিস্তানকে বোঝাতে চেষ্টা করে। এমনকি হিউম মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন ইয়াহিয়ার ওপরে এ বিষয়ে চাপ তৈরি করতে। ব্রিটেন অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিশ্চত হতে পারেনি যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন পক্ষকে সে সমর্থন করবে। এর অন্যতম কারণ ছিল উভয় দেশেই ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ। অক্টোবর মাসের শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটেন সফরে আসেন। এসময় থেকেই ব্রিটেন ভারতের প্রতি অনেক বেশি নমনীয় হতে থাকে কারণ ইন্দিরা গান্ধী সামগ্রিক পরিস্থিতি সুচারুরূপে বোঝাতে সক্ষম হন। নভেম্বরের শুরুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে ব্রিটেন পরিস্থিতি যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটেন ভারত-পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনায়ও ততটা আগ্রহ দেখায়নি।[৮] এসময় ব্রিটেনে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরিতে যে কার্যক্রম চলছিল সেটিতে কোনো বাধা না দেওয়ার নীতি নেয় দেশটি। ব্রিটেনের অবস্থান ছিল এমন যে, আইনের মধ্যে থেকে মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটাতে তারা কোনো বাধা দিতে পারে না। কিন্তু এরপরও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটেন ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানায়, জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রধানমন্ত্রী হিথ ইয়াহিয়াকে ৭ নভেম্বর লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্রে পাকিস্তান বিরোধী সংবাদ প্রকাশে ইয়াহিয়া খুশি না হলেও ব্রিটিশ সরকার সংবাদপত্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে চায় না কারণ জনগণের ওপর নির্যাতন অব্যাহত থাকলে বিরূপ সংবাদ প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। ব্রিটেন আহ্বান জানায় বিদেশি সাংবাদিক ও পরিদর্শকদের পূর্ব পাকিস্তানে আসার অনুমতি দিতে।[৯] একটি পর্যায়ে ব্রিটেন নিরাপত্তা পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান সংকট উত্থাপনের বিপক্ষে মত প্রদান করে কারণ সমস্যা সমাধানে এ ধরনের ফোরামে বিতর্ক কোনো সমাধান আনবে না। পরবর্তীতে ৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে ব্রিটেন ভোটদানে বিরত থাকে।[১০]

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালে আমেরিকা ও তার মিত্ররা একদিকে যেমন পাকিস্তানের পক্ষে থেকে সবধরনের হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞকে বৈধতা দিয়েছে তেমনি বিপরীত অবস্থানে থেকে ব্রিটেন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

৩. তথ্যের স্বল্পতা

পাকিস্তানের সামরিক সরকার ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থানরত ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে বহিষ্কার করে। ২৭ মার্চ সকালে তারা ঢাকা

ত্যাগ করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ২৫ মার্চ এবং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি বিশ্ববাসীকে জানতে না দেওয়া। পাশাপাশি ঢাকা থেকে সংবাদ প্রেরণের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এসোসিয়েটেড প্রেসের মিশেল লরেন্ট এবং ডেইলি টেলিগ্রাফের সাইমন ড্রিং আত্মগোপনে থেকে বহিষ্কারাদেশ এড়াতে সক্ষম হন এবং ২৬ মার্চ ও পরের দুই-তিনদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিদেশি সাংবাদিকরা তথ্যসংগ্রহের জন্য ভারতীয় এবং পাকিস্তানি সরকারি উৎসের সহায়তা নেন। সুতরাং উৎসজনিত ভিন্নতায় তথ্যের গরমিলের বিষয়টি ছিল কিছুটা স্বাভাবিক। তবে বিদেশি সংবাদপত্রগুলো সীমান্ত এলাকায় তাদের নিজস্ব উৎস এবং নিজ নিজ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সহায়তায় বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়। এমনকি অনেক ব্রিটিশ সাংবাদিক গোপনে সীমান্তবর্তী এলাকা ও যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ২৬ মার্চ কার্ফিউ এবং সামরিক আইন জারি করে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়াও প্রেস সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। কিন্তু এরপরও *ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এর সাইমন ড্রিং, *গার্ডিয়ান*-এর মার্টিন উল্লাকট, *টাইমস* পত্রিকার পিটার হেজেলহার্স্ট ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের ভেতর সংবাদ সংগ্রহ করেন।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সরকার ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে সরকারি বিধিনেষেধ মেনে ঢাকায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে ২৫ মার্চের পর প্রথমবারের মতো পাকিস্তানি বর্বরতার এক করুণ কিন্তু ভয়ংকর চিত্র পর্যবেক্ষণের সুযোগ বিদেশি গণমাধ্যম কর্মীদের তৈরি হয়। মার্কিন সাংবাদিক ম্যালকম ব্রাউন ছাড়াও টাইম ইনকর্পোরেটেড, *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* (লন্ডন) এবং এসোসিয়েটেড প্রেসের সাংবাদিকরা এ সময় তাদের পর্যবেক্ষণ ও গৃহীত সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে একাধিক প্রতিবেদন তৈরি করেন।[১১] মে মাসের শেষ সপ্তাহে *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *লসএঞ্জেলস টাইমস*সহ আরও কয়েকটি পত্রিকা ও দেশের সাংবাদিক চারদিনের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি পান, কিন্তু এ সময়ও তাদের বিধিনিষেধ মেনেই কাজ করতে হয়েছে।[১২] তবে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সাংবাদিকদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। এ সময় ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সাংবাদিকদের বাংলাদেশে প্রেরণ করে এবং ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভয়ার্ত ও থমথমে পরিস্থিতির ওপর একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের একাধিক প্রতিবেদন ব্রিটিশ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১৩] জুন মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পাকিস্তান সরকার পুনরায় সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করে। ১৯ জুলাই এক ঘোষণায় বলা হয় যে কেউ মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী, গণবাহিনী, বাংলাদেশ, জয় বাংলা এসব শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। ৩০ সেপ্টেম্বর অপর ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু, তাঁর বাবা-মা কিংবা পরিবারের সদস্যদের ছবি ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়।[১০] এভাবে ১৯৭১ সালে বিদেশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

৪. ব্রিটিশ সংবাদপত্রের ভূমিকা

৪.১. ২৫ মার্চের কাল রাত

২৫ মার্চের পর ব্রিটিশ সরকার মূলত বাংলাদেশে অবস্থারত ব্রিটিশ নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ব্রিটিশ সরকার সামগ্রিক বিষয়টিকে এ সময় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলেও ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদপত্র ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ড, বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। যুক্তরাজ্যের পত্রিকাগুলোর মধ্যে এই বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে *ডেইলি টেলিগ্রাফ*। সমস্ত বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা থেকে বহিষ্কার করা হলেও সাইমন ড্রিং ২৫ মার্চের পর গোপনে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেসব প্রত্যক্ষ পরিদর্শনলব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে ৩০ মার্চ পত্রিকাটি "Tanks Crush Revolt in Pakistan" শিরোনামে একটি দীর্ঘ বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ড্রিং এই প্রতিবেদন প্রেরণ করেছিলেন ব্যাংকক থেকে। প্রতিবেদনটিতে ড্রিং এর নামের নিচে লেখা ছিল "Who was in Dacca during the fighting"। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলতে গিয়ে শিরোনামে উল্লেখ করা হয়, "In the name of God and a United Pakistan."

বস্তুতপক্ষে ড্রিং এর প্রতিবেদন থেকেই ২৫ মার্চ ও এর পরের কয়েকদিন ঢাকার প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল সেটির একটি দৃশ্যপট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে ইয়াহিয়ার সমালোচনা করে বলা হয় যে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এমন ঘোষণার পরও বিনা উসকানিতে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছিল। প্রতিবেদনটিতে ২৫ মার্চ ও পরের কয়দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর ও পুরান ঢাকায় পরিচালিত নৃশংসতার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার চিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে ড্রিং মন্তব্য করেন,

> Only the horror of the military action can be properly guided the students dead in their beds, the butchs is in the markets killed behind their stalls, the women and children roasted alive in their houses, the Pakistanis of Hindu religion taken out shot en masse, the bazaars and shopping ares razed by fire and the Pakistan flag that now flies over every building in the capital.[১৪]

২৬ ও ২৭ মার্চ ঢাকার পরিস্থিতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইসলাম ও পাকিস্তানের নামে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি উঠে আসে। এ সময় ঢাকার রাস্তায় সৈন্যদের "নারায়ে তাকবির" এবং "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" স্লোগান দেওয়ার কথা পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটি অপারেশন সার্চলাইটের সময়ানুক্রমিক একটি বিবরণ উপস্থাপন করে উল্লেখ করে যে, রাত ১০টার কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যারাক থেকে বের হয়ে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে।[১৫]

ড্রিং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের আশেপাশের বিশেষত ইংরেজি দৈনিক *পিপলস*-এর অফিস সম্পূর্ণ ধ্বংস করার একটি বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২৬

মার্চ ভোরের পর গুলিবর্ষণ কিছুটা কমে আসলেও তা দুপুর নাগাদ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী ১১ ঘণ্টায় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। এ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পুরান ঢাকার ইংলিশ রোড, নয়া বাজার, চকবাজার এবং অন্যান্য এলাকায় হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ সময় যারা বাড়ি থেকে বের হতে পারেনি তারা জীবন্ত পুড়ে মৃত্যুবরণ করে বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয় পুরান ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। এখানে ঘর থেকে বের করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং সমগ্র এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* উল্লেখ করে যে, কিছু কিছু এলাকায় ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত গুলিবর্ষণ অব্যাহত থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় ২৬ মার্চ রাত ১১টার মধ্যে অভিযানের প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলা পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক*। ২৫ মার্চ রাতের পর প্রায় ৪০০ ব্যক্তি *ইত্তেফাক* পত্রিকার অফিসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু ২৬ মার্চ বিকাল ৪.৩০ এর দিকে চারটি ট্যাংক থেকে গোলাবর্ষণ করে *ইত্তেফাক* ভবন সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, ২৭ মার্চ বিকেল ৪টার আগেই ঢাকার রাস্তাঘাট পুনরায় জনশূন্য হতে থাকে এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হঠাৎ করেই গুলিবর্ষণ শুরু করে। এসময় সাধারণ নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্রও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে উঠে এসেছে। ঢাকায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করেছে সেটি সম্পর্কে একমাত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাইরে অন্য কারও ধারণা ছিল না বলে *ডেইলি টেলিগ্রাফ* উল্লেখ করে।[১৬]

অপর ব্রিটিশ পত্রিকা *অবজারভার* ২৫ মার্চ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে “The Fading Dream of Bangladesh” শিরোনামে ১৮ এপ্রিল প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি তৈরি করেন কলিন স্মিথ। তিনি ছিলেন ২৫ মার্চের পর ঢাকায় ভ্রমণকারী প্রথম ব্রিটিশ সাংবাদিক। তিনি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকার পরিস্থিতির ওপর একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন লন্ডনভিত্তিক একজন ইটালিয়ান ফ্রিল্যান্স ফটো সাংবাদিক রোমানো কাগননি। তারা পরিচয় গোপন করে পানি উন্নয়ন বোর্ডের টেকনিশিয়ান পরিচয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন।

২৫ মার্চের বর্বরতার সমালোচনা করে ৩১ মার্চ *গার্ডিয়ান* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে “A Massacre In Pakistan” শিরোনামে। জোরালো ভাষায় হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের জন্য ভুট্টো ও ইয়াহিয়াকে দায়ী করে উল্লেখ করে যে আলোচনার অন্তরালে পাকিস্তানি জেনারেলরা হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। হত্যাকাণ্ডকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে *গার্ডিয়ান* সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করে: “unity can never come through murder and is not worth the price of innocent lives. The fate of Dacca is a crime against humanity and human aspirations; no one should stand mealy-mothed by.”[১৭] প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশি সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব তথ্য উপাত্তকে *গার্ডিয়ান* তাদের ১১ মার্চের সম্পাদকীয়তে ভীতিকর বলে উল্লেখ করে ঘোষণা করে যে, অগণিত নিরস্ত্র এবং অপ্রস্তুত বাঙালি নিহত হয়েছে।

পত্রিকার মতে এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমই পাকিস্তান সংকটের সামগ্রিক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে। ২৫ মার্চের আগে সামগ্রিক সংকটের জন্য মুজিবকে দায়ী করা হলেও ইয়াহিয়ার সহিংসতার কারণে এসব অভিযোগ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বলে *গার্ডিয়ান* উল্লেখ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলে পূর্ব পাকিস্তানকে কেবলমাত্র একটি দখলিকৃত এবং শোষিত দেশ হিসেবেই আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

একইভাবে *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকা হত্যাকাণ্ড, তথ্য গোপন ও বিকৃতির জন্য পাকিস্তান সরকারকে দায়ী করে। পত্রিকাটির মতে প্রেস সেন্সরশিপ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করার পরও ঢাকার যেসব সংবাদ এসে পৌঁছেছে তা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করবে। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান ফিরে সামরিকবাহিনীকে ধন্যবাদ দিয়ে "Order was restored" বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন পত্রিকাটি তাদের ২ এপ্রিলের প্রতিবেদনে এর সমালোচনা করে। পত্রিকাটি মন্তব্য করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞকে ইয়াহিয়া "order" হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেখানে যুক্তিসংগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষ অপরাধী কারণ তারা সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।[১৮]

টাইমস গণহত্যার তথ্য গোপনের জন্য ইয়াহিয়াকে অভিযুক্ত করে ৩ এপ্রিল "The Slaughter in East Pakistan" শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে ঢাকা ও অন্যান্য শহর থেকে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য প্রকৃতবিচারে পরিস্থিতির ভয়াবহতা ইঙ্গিত করে। পত্রিকাটি ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করে যে, কেবল একদিনে যে পরিমাণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে তা সাধারণের কল্পনা বা হিসাবের বাইরে। পত্রিকাটি এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করে যে, পরিস্থিতি এর চেয়েও ভয়াবহ। পত্রিকাটি গণহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করে যে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করে যে– কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন দমন করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।[১৯] অপর ব্রিটিশ সাপ্তাহিক পত্রিকা *ইকোনমিস্ট* ইয়াহিয়ার সমালোচনা করে ৩ এপ্রিল মন্তব্য করে: "East Pakistan's Sheikh Mujib looks a loser today, but it is more likely that Predsident Yahya has chosen the road that leads to a civil war he cannot win."[২০]

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো ২৫ মার্চ থেকে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশের পাশাপাশি অপারেশন সার্চলাইটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *টেলিগ্রাফ* ৪ এপ্রিল এ বিষয়ে প্রকাশিত বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান প্রকৃত অর্থে জেনারেল এবং কর্নেলদের বিগত দুই বছরের পরিকল্পনার ফসল। কোনো প্রকার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস না করা এরা পাকিস্তানের রক্ষণশীল সমাজে এলিট এবং সামরিক নেতৃত্বের মূল কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। পত্রিকাটি এই এলিটদের ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করে, "They did not believe in it because they are not democrats by nature, by upbringing or by belief, but autocratic, physical and patrician contemptuous of 'the mob,' more of

the 18th century than the 20th."[২১] পত্রিকাটির মতে তারা আইয়ুব খানের বিপক্ষে সংঘটিত গণ আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং বুঝতে পারেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনাকে যদি আটকানো না যায় তাহলে এটি তাদেরও ধ্বংস ডেকে আনবে। পাকিস্তানের জেনারেলরা মনে করতেন আরেকটি অভ্যুত্থান কিংবা বেসামরিক সরকারের কাছে পুনরায় ক্ষমতা হস্তান্তর তাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে। *টেলিগ্রাফ* উল্লেখ করে যে, নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর কাছে বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোর ওপর একটি মিথ্যা আবরণের বাইরে আর কিছুই না। ১৯৭০ সালের নির্বাচন পত্রিকাটির মতে ছিল অপ্রত্যাশিত কারণ এটি এক ব্যক্তি (মুজিব) এবং একটি দলকে (আওয়ামী লীগ) সর্বময় ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৬ তারিখ থেকেই ইয়াহিয়াসহ পাকিস্তানের জেনারেলরা জানতেন যে কী করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাটি ইয়াহিয়াকে বাঙালির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে।[২২] ২৫ মার্চের পরদিনই পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই সময় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করা বিদেশি সাংবাদিকদের ভাষ্যে এই হত্যাকাণ্ডের করুণ চিত্র পাওয়া যায়। অবজারভারের ১৮ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ২৬ মার্চ ঢাকায় কাক ও চিলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং মৃতদেহ সরিয়ে ফেলায় এসব পাখি মূলত অনেক বেশি সংখ্যায় ঢাকার আকাশে ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ২৫ মার্চ রাতে এবং ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় এই প্রতিবেদনে।[২৩]

৪.২ হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন

২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ওপর একাধিক প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রকাশের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস জুড়েই পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সেসবের ওপরেও ব্রিটিশ সংবাদপত্র নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ২ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানি বাহিনীর এধরনের হত্যাকাণ্ডের কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। পত্রিকাটির মতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে প্রতিরোধ করতেই পাকিস্তান সামরিকবাহিনী ২৫ মার্চ হস্তক্ষেপ করে। পত্রিকাটি এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করে যে, যথাযথ সংবাদ না পাওয়ার দায় সম্পূর্ণ পাকিস্তান সরকারের।[২৪]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে *গার্ডিয়ান* পত্রিকার মার্টিন উলাকট ফরিদপুর, মাগুরা ও যশোর এলাকা ভ্রমণ করেন। এসব এলাকায় ২৫ মার্চের পর যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় সেসব বিবরণের ওপর ভিত্তি করে পত্রিকাটিতে ৪ এপ্রিল "A Cry for Help" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে হত্যাকাণ্ডের সময় যেসব প্রত্যক্ষাদর্শী ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করা হয়। এসব বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানি বাহিনী বিনা উসকানিতে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সব বাঙালিকেই হত্যা করেছে।[২৫]

একইভাবে পিটার হেজেলহাস্ট এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে যশোর ভ্রমণ করেন এবং ঝিকড়গাছা অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের ওপর তার প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে *টাইমস* ১০ এপ্রিল "The Limits of Tower" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২৫ মার্চ রাতে যে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সূচনা হয় সেটি ইয়াহিয়ার প্রত্যক্ষ নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিল। এ বিষয়ে *সানডে টাইমস* ১১ এপ্রিল "Murder has been Arranged" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেঃ "Sgt-Major Rab and his forces ... have overheared on their captured military radio official orders from Pesident Yahya Kahn's high command that opposition be crushed by slaughtering indiscriminately, destroying indiscriminately and above all, by killing all military, civic and intellectual leaders."[২৬] ঢাকার পাশাপাশি পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে এপ্রিলের শুরু থেকে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। সাংবাদিক নিকোলাস টমালিন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিনাজপুর এলাকা ভ্রমণ করে যে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন সেটির ওপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেন যে তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার আগেই সম্ভবত রবসহ ৩৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা, যাদের কাছে হালকা অস্ত্রের বাইরে কিছুই নেই, মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উল্লেখ করেন, "Genocide is an over-used word … The killing is taking place. We have seen the massacres with our own eyes ..."[২৭]

ঢাকা শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে *টাইমস* ১৩ এপ্রিল "Thousands Still Fleeing Frightened Dacca" শিরোনামে লাইনে দাঁড় করিয়ে বাঙালিদের হত্যার বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গে *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকার একটি প্রতিবেদন প্রণিধানযোগ্য। পত্রিকাটির ১৬ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়ঃ "If blood is the price of a people's right to independence, Bangladesh has over paid."[২৮]

২৫ মার্চ থেকে চলা হত্যাকাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায়। বাঙালি মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন সেটি প্রায় সবকটি ব্রিটিশ পত্রিকাই আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। যেমন *অবজারভার* ১৮ এপ্রিল প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে হিন্দুদের বিপক্ষে চলা হত্যাকাণ্ডকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়কার দাঙ্গার সাথে তুলনা করে। প্রতিবেদক কলিন স্মিথের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যেখানে বুঝতে পারা যায় যে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে পাকিস্তানি বাহিনী কী ধরনের সাম্প্রদায়িক বর্বর আচরণ করেছিল। তিনি উল্লেখ করেন, "The bodies of uncircumcised Hindu men have been found with their penis cut off."[২৯] প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয় যে ঢাকার অধিকাংশ মানুষ গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলেন। যারা থেকে গিয়েছিলেন তাদের দিন অতিবাহিত হচ্ছিল আতঙ্কের মধ্যে। সন্ধ্যার পর অনেক বাড়িঘরে লুটপাট, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য এটি ছিল স্বাভাবিক।

অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের কালিমা পড়তে বলা হত, পুরুষদের সুন্নতে খতনা হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করা হতো।[৩০] একইভাবে *সানডে টাইমস* ১৮ এপ্রিল উল্লেখ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বায়ত্তশাসন দাবি করায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। পত্রিকাটির মতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সুচিন্তিতভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্য যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা নজিরবিহীন।[৩১] এপ্রিল মাসের শুরু থেকে বিভিন্ন বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে কোনো খাদ্য সংকট দেখতে না পেলেও *অবজারভার* ১৮ এপ্রিল উল্লেখ করে যে ঢাকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। খাদ্য, কেরোসিন, লবণসহ হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবকিছুরই সংকট থাকার কথা প্রতিবেদক কলিং স্মিথ উল্লেখ করেন যিনি ওই সময় ঢাকা ভ্রমণ করছিলেন।[৩২]

টাইমস ১৫ মে কলকাতার বিভিন্ন শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশিদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মতে পাকিস্তানি বাহিনী অনেককে হত্যা করেছে হিন্দু ভেবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করার আগে জিজ্ঞাসা করেছে যে তারা বাঙালি নাকি অবাঙালি, হিন্দু নাকি মুসলমান। এমনও হয়েছে যে নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পরও পাকিস্তানি বাহিনী তা বিশ্বাস করেনি।[৩৩]

গণহত্যা সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের ধারাবাহিকতায় ১৩ জুন *সানডে টাইমস* “Genocide” শিরোনামে এন্থনি মাস্কারেনহাসের সুবিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তিনি করাচিতে *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের যে চিত্র তিনি এপ্রিলের শেষ ১০ দিন পর্যবেক্ষণ করেছেন সেটি পাকিস্তান ত্যাগ করে ১৮ মে লন্ডন পৌঁছে বিশ্ববাসীকে জানাতে উদ্যোগী হন। প্রতিবেদনটিতে বাঙালিদের হত্যা করার পেছনে একজন পাকিস্তানি অফিসারের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়ঃ “Because he might be Hindu or he might be rebel, perhaps a student or an Awami Leaguer. They know we are sorting them out and they betray themselves by running.”[৩৪] এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেবল হিন্দু হওয়ার কারণে গুলি করা ও আমৃত্যু পেটানো হয়েছে। *সানডে টাইমস* এই প্রতিবেদনটির গুরুত্ব তুলে ধরে মন্তব্য করেঃ “The Report by Anthony Mascarenhas is a detailed eye-witness account of unique precision and authority. He supplies the missing centre-piece of the tragedy of Bengal: why refugees have fled.”[৩৫] এই প্রতিবেদনে বাঙালির পাশাপাশি যশোর, খুলনা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবাঙালি নিহত হওয়ার বিষয়টিও উঠে এসেছে। পত্রিকাটি পাকিস্তানি বাহিনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর অনেকেই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেন যে, তাঁরা মনে করেন বাঙালি সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে কলকাতার বারোয়ারি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং তাঁরা যা কিছু করেছেন সেটা এই অঞ্চলে জনগণের বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই করেছেন।[৩৬]

সানডে টাইমস পত্রিকার মারি শেল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে বেড়িয়ে স্থানীয় জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং এর ভিত্তিতে ১১ জুলাই পত্রিকাটিতে "A Regime of Thugs and Bigots" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তিনি খুলনার হিন্দু অধ্যুষিত লতা পাহাড়পুর গ্রামে গিয়ে সমস্ত গ্রাম মানুষ শূন্য অবস্থায় পেয়েছেন। হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হওয়ায় সরকার হিন্দুদের এসব পরিত্যাক্ত জমি গ্রহণ করে বলেও পত্রিকাটি উল্লেখ করে। এই প্রতিবেদনে বাঙালি নিধনে রাজাকার বাহিনীর ভূমিকাও তুলে ধরা হয়– যারা পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ছিল "Good champs, good Muslims and loyal Pakistanis." খুলনা অঞ্চলে কর্নেল শাম্‌স পুলিশের রাইফেল বিতরণ করার মাধ্যমে রাজাকার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বলে পত্রিকাটি উল্লেখ করে। এছাড়াও উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ৫০০০ জন রাজাকারের মধ্যে ৩০০ জনই খুলনা বিভাগের যারা দৈনিক তিন রুপি করে ভাতা পেয়ে থাকে। রাজাকাররা স্থানীয় শান্তি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় যারা পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। প্রতিবেদক রাজাকারদের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানি বাহিনীকে আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং কর্মীদের বাড়িঘর চিনিয়ে নিরাপদে সেখানে নিয়ে যাওয়া। পত্রিকাটি রাজাকার বাহিনীকে উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন "Orange Lodges" এর সাথে তুলনা করে মন্তব্য করে, "These people are, infact, representatives of the political parties which were routed at the last elections, with an admixture of men with criminal records and bigoted Muslims who have been persuaded that strong arm methods are needed to protect their religion - a mixture weirdly reminiscent of the Orange Lodges."[৩৭] *ইকোনমিস্ট* ৩১ জুলাইয়ের প্রতিবেদনেও উল্লেখ করে যে, হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের খোঁজ বের করে দেওয়াই শান্তি কমিটির প্রধান কাজ যেখানে এই কমিটি গঠিত হয়েছে মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের মাধ্যমে।[৩৮]

অক্টোবর মাসে মুক্তিবাহিনীর কৌশলগত আক্রমণ ও গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হয়। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো এ সময় নিয়মিতভাবে এসব সংবাদ প্রকাশ করেছে। যেমন ২৭ অক্টোবর *টেলিগ্রাফ* "50 Die in Pakistani Reprisal." শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতায় চারজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হওয়ার জেরে পাকিস্তানি বাহিনী পুলিশ ও রাজাকারের সহায়তায় দয়াগঞ্জে প্রায় ৫০ জন নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করে। একইভাবে *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* ২৭ অক্টোবরের "Reprisals Continue Against Unarmed East Pakistanis" শিরোনামে প্রতিবেদনে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *ডেইলি মিরর* ৪ ডিসেম্বর বাঙালির বিপক্ষে সংগঠিত আটমাসের হত্যাকাণ্ডকে সুনির্দিষ্ট গণহত্যা বলে উল্লেখ করে। পত্রিকাটির মতে এই তালিকায় আছে নির্বাচিত রাজনীতিবিদ,

শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, যুবক এবং ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠী। ডিসেম্বর মাসে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড আরো বৃদ্ধি করে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো এই সময় একেকটি মুক্তাঞ্চল নিয়ে যেমন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে তেমনি একই সাথে এসব নৃসংশতাও প্রতিবেদনে স্থান পায়। *ওয়ার্কার প্রেস* পত্রিকায় ১১ ডিসেম্বর "Retreating Pakistanis Take Their Revenge on Bengalis" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল এমনই।

৪.৩ শরণার্থী ও মানবিক সহায়তা

২৫ মার্চের পর থেকেই মানুষজন ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। ২৬ মার্চ সারাদিন গুলিবর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত থাকায় মূলত ২৭ মার্চ সকাল থেকেই মানুষের ঢাকা ছাড়ার এই স্রোত পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলো মার্চের শেষ থেকেই আতঙ্কিত মানুষজনের ঢাকা ত্যাগ এবং শরণার্থী বিষয়টিকে উপজীব্য করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* বিষয়টিকে তাদের ৩০ মার্চের প্রতিবেদনে তুলে ধরে উল্লেখ করে যে ২৭ মার্চ সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কার্ফিউ শিথিল থাকার ঘোষণায় মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। যদিও রাস্তায় তখনও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের টহল অব্যাহত রেখেছিল এবং পুরান ঢাকা থেকে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু অধিকাংশ এলাকায় রাস্তাঘাট তখন আতঙ্কে ঢাকা ছাড়তে থাকা মানুষ দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত গাড়ি, রিকশা এবং মূলত পায়ে হেঁটে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রসহ ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করে। ২৭ মার্চ দুপুরের দিকে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদক সায়মন ড্রিং শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের দুর্দশার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় নীরবে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করছিলেন। এ সময় অধিকাংশ মানুষের চোখে-মুখে ছিল আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তার ছাপ। অনেক বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ব্যক্তি সহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে সায়মন ড্রিং উল্লেখ করেন, "Silent and unsmiling they passed and sew what the Army had done. It had been a through job, carefully planned and meticulously executed and they looked the other way and kept on walking."[৪০] পাকিস্তান সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার কথা ঘোষণা করলে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো এ ধরনের বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার করে। অনেক পত্রিকা এপ্রিলের শুরুতেই শরণার্থী সংকট, মানবিক বিপর্যয় ও খাদ্য সংকটের আশঙ্কা প্রকাশ করে। *নিউ স্টেটসম্যান* ২ এপ্রিল ঢাকা ছেড়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চলে যেতে থাকা মানুষের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা পেট্রোল ঢেলে সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় খুঁজতে যাওয়া এসব মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিবেদক মারভিন জোনস এ পরিপ্রেক্ষিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, সীমান্তবর্তী ও গ্রামীণ এলাকায় শরণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যসংকট এবং বিভিন্ন রোগবালাইয়ে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাবে।[৪১]

গার্ডিয়ান পত্রিকার মার্টিন উলাকট এপ্রিলের শুরুতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ফরিদপুর, যশোর ও মাগুরা অঞ্চলে ভ্রমণ এবং স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এসব তথ্য

উপাত্তের ভিত্তিতে পত্রিকাটি ৪ এপ্রিল "A Cry for Help" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে পরাশক্তি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রতি সাহায্যের মানবিক আবেদন উচ্চারিত হয়েছে। পত্রিকাটি শরণার্থী সংকটের দিকে ইঙ্গিত করে অধিকাংশ শহর মানুষ শূন্য এবং কুষ্টিয়া ও কুমারখালী অঞ্চলের রাস্তায় শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করে।

মানবিক সহায়তার পাশাপাশি ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোতে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। মে মাসের শুরুতে যখন ভারতে বাংলাদেশ থেকে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভারতের একার পক্ষে শরণার্থী স্রোত মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সে সময় গার্ডিয়ান ৭ মে সম্পাদকীয় কলামে শরণার্থী সংকটে বহির্বিশ্বের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা করে মন্তব্য করে,

> It makes nonsense that India, with its own refugee and population problems and a frail economy, should have to cope alone with this additional burden. Even if many of these displaced are waiting only for some sort of calm before returning to their villages across the border there is a need for urgent international action to help the Indian Government bear the strain.[৪৩]

একইভাবে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বড় বড় শহর ও বন্দর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধীনে থাকলে তা খাদ্যঘাটতি এবং শরণার্থী সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারে বলে *টাইমস* ১০ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।[৪৪]

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোতেও শরণার্থীশিবিরের পরিস্থিতি বর্ণনা করে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যেমন পিটার হেজেলহার্স্ট কলকাতার বনগাঁও এর শরণার্থীশিবির পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সেটির ভিত্তিতে *টাইমস* পত্রিকায় ১৫ মে "Unbelievable Misery" শিরোনামে বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই বর্ণনাতেও শরণার্থীশিবিরগুলোর জনাকীর্ণ পরিস্থিতি উঠে এসেছে। সীমিত সম্পদ নিয়ে শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান করার মতো একটি দায়িত্ব পালন করায় টাইমস ভারত সরকারের প্রশংসা করে। পত্রিকাটির মতে ১৫ মে পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ শরণার্থী বনগাঁও ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে নতুন কোনো শরণার্থী গ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি সেখানে ছিল না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি স্থাপনা, সাময়িকভাবে স্থাপিত তাঁবু সবই শরণার্থী দিয়ে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যারা সীমান্ত পার হয়ে আসার সময় কিছু অর্থ সাথে আনতে পেরেছিলেন তারা অনেকেই রাস্তার পাশে অস্থায়ী কুঁড়েঘরের মতো বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকাটির মতে অধিকাংশ বাঙালি দেশত্যাগ করার সময় কিছু ছেঁড়া জামা কাপড়ের বাইরে আর কিছুই আনতে পারেননি। [৪৫]

শরণার্থী সংকট ভারতের একার পক্ষে যে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় সেটি পত্রিকাগুলোর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। *টাইমস* ১ জুন "Bengal's Suffering Millions"

শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে অধিক খাদ্য সহায়তার ওপর জোর দেয়। কলেরা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শরণার্থী প্রবাহ অব্যাহত থাকায় বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকাটি ইয়াহিয়ার সমালোচনা করে উল্লেখ করে যে যদিও পাকিস্তান সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দাবি জানিয়েছে কিন্তু শরণার্থীদের স্রোত এটিই প্রমাণ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সম্পাদকীয়তে পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করতে।

জুন মাসে শুরু থেকে কলেরা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে পত্রিকাগুলো এর ভয়াবহ প্রভাব এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের একক প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *টেলিগ্রাফ* ৫ জুন "Cholera out of Control" শিরোনামে ভারতে দ্রুত ও জরুরি ভিত্তিতে কলেরা ভ্যাকসিন, গুঁড়ো দুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক সরবরাহের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা যেমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তেমনি পাকিস্তান সরকার বিশ্ববাসীকে স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখানোর লক্ষ্যে শরণার্থীদের জন্য যেসব অভ্যর্থনা কেন্দ্র চালু করেছিল সেগুলোতে আগ্রহ ছিল কম। *ডেইলি টেলিগ্রাম* ৯ জুলাই "War Spirit Grow on Trigger. Happy Pakistan Border" শিরোনামে উল্লেখ করে যে শরণার্থীদের ফেরার আগ্রহ কম হলেও প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার অনুমোদিত পথের বাইরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী হিসেবে প্রবেশ করছিল। পত্রিকাগুলো এ সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। যেমন– *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ৯ জুলাই "Indian State Swamped by Refugees" শিরোনামে ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী পরিস্থিতির ওপর একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাটি এ প্রেক্ষিতে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিক থেকে শরণার্থী পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তি শরণার্থী হিসেবে গৃহহীন এবং অর্ধাহারে ও অনাহারে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মুক্তাঞ্চলে বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনো গ্রামে আত্মগোপন করে আছে। পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, রাও ফরমান পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ বাস্তুচ্যুত পূর্ব পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ করা যথেষ্ট কঠিন কারণ এদের অনেকের সাথেই গেরিলাদের যোগাযোগ আছে।

শরণার্থী সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের ধারাবাহিকতায় *সানডে টাইমস* ১১ জুলাই "A Regime of Thugs and Bigots" শীর্ষক প্রতিবেদনে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মন্তব্য করে যে, বিদ্বেষপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজমান থাকলে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সম্ভবপর হবে না। প্রতিবেদনটিতে দেশের ভেতর স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজমান থাকার দাবি করায় ইয়াহিয়ার সমালোচনা করা হয়। *সানডে টাইমস* গঠনমূলকভাবে মন্তব্য করে যে, একমাত্র পাকিস্তান ও ভারতের যৌথ উদ্যোগই শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে সহায়ক হতে পারে। জুলাই মাসের শেষ দিকে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো শরণার্থীশিবিরের অবস্থা ও সমস্যা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ অব্যাহত রাখে।

ব্রিটিশ সংবাদিকদের অনেকেই এ সময় শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং এর ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় একাধিক বর্ণনামূলক প্রতিবেদন। *সানডে টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ২৫ জুলাই “Still No End to Bengal Flight” শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল এ ধরনেরই একটি প্রতিবেদন। এতে স্পষ্ট যে আতঙ্কিত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত বাঙালিরা দেশত্যাগের আগে তাদের সবচেয়ে পছন্দের জিনিসটি সাথে আনতে চেয়েছে। প্রতিবেদনটিতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে: “Refugees carry everything and nothing all tied up in dirty sacking and old saris. One old man in Bogra sat listless on his hunches dabbling his fingers in a stone jar of little fish brought from over the border.”[৬৫] শরণার্থী ইস্যুতে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো ইয়াহিয়াকে সবসময় সমালোচনামূলকভাবে উপস্থাপিত করেছে। *ইকোনমিস্ট* ৩১ জুলাই “Time is Running out in Bengal” শিরোনামে ইয়াহিয়ার হিন্দু শরণার্থীদের দেশে ফেরার আহ্বান এবং একই সাথে ইসলামিক সংবিধান প্রণয়ন করার বিষয়টিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করে। পত্রিকাটির মতে শরণার্থীদের একটা বড় অংশ হিন্দু এবং প্রায় ৭০ লক্ষ শরণার্থীদের মধ্যে ৬০ লক্ষ হিন্দুধর্মের। *ইকোনমিস্ট* এ পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করে যে, “Those interviewed, on the border, all say they are leaving because it is being make clear to them that they will have no place in the future Pakistan … the people they complain of are the Bengali members of the right wisng religious parties Jamat Islami and the Moslem League...”[৪৬]

২৫ মার্চের পর থেকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী বৃদ্ধির যে ধারা শুরু হয়েছিল সেটি অক্টোবর মাসেও অব্যাহত থাকে এবং প্রায় নব্বই লাখে উন্নীত হয়। এ পরিস্থিতিতে *ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড* ৮ অক্টোবর “India Faces New Flow of Refugees” শিরোনামে শরণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করে। পত্রিকাটির মতে খাদ্যঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ এবং মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অক্টোবর মাসে নতুন করে শরণার্থীদের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। একটি পর্যায়ে ৪ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে *ডেইলি মিরর* উল্লেখ করে যে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি যাদের শরণার্থীশিবিরগুলোতে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে।[৪৭]

৪.৪ বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার, অবস্থান ও বিচার

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের একটি বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যে ডেইলি টেলিগ্রাফে ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে রাত ১টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে তিনি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং তাঁর দেহরক্ষী ও ব্যক্তিগত কাজে সহায়তাকারী ব্যতীত পরিবারের অবশিষ্ট সকলকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এর আগে পাকিস্তানি বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করা হলে তিনি তার বাড়ি ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* উল্লেখ করে যে, মুজিব উল্লেখ করেন, “If I go

into blinding they will burn the whole Dacca to find me.” বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ির একজন প্রতিবেশীর ভাষ্যে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে রাত ১টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি বাহিনী ট্যাংক ও ভারী যানবাহনসহ বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে অবস্থান নেয়। গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন: “Yes, I am ready, but there is no need to fire. All you need to have done is call me on the telephone and I would have come.”[৪৮] ২৫ মার্চের পর বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও তাঁর অবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও *টাইমস* ৩ এপ্রিল “The Slaughter in East Pakistan” শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গোপনে ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনার চেষ্টা করলে যুক্তরাজ্যের পত্রিকাগুলো বিষয়টিকে উপজীব্য করে বিভিন্ন তথ্যবহুল প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে ২৫ মার্চের আগে স্বাধীনতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়।

সানডে টাইমস বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে। পত্রিকাটি এ প্রেক্ষিতে ১৮ এপ্রিল “Pakistan: A Time to Speak Out” শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক ইয়াহিয়া সরকারকে দ্রুত বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং তাঁকে ঢাকায় ফিরিয়ে এনে আলোচনার আহ্বান জানায়। মে মাসেও পত্রিকাগুলো বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিষয়টিকে উপজীব্য করে একাধিক সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর ভূমিকা সমালোচনামূলকভাবে অধিকাংশ পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। *গার্ডিয়ান* ১৩ মে “The Silent Conscience” শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নির্বাচিত নেতার একজন অনির্বাচিত সামরিক একনায়কের হাতে বন্দি হওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করা হয়। যদিও পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপিত হয় *গার্ডিয়ান* বঙ্গবন্ধুকে শান্তির সপক্ষে ভূমিকা পালনকারী একজন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর মুক্তিকেই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান ও শরণার্থী সমস্যার পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করে।

যুক্তরাজ্যের কয়েকটি পত্রিকা ইয়াহিয়ার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সামরিক আদালতে গোপনে বিচার প্রহসনমূলক হওয়ার যে আশঙ্কা ছিল এসব প্রতিবেদন সেটিকেই সত্য প্রমাণিত করে। *ফিন্যান্সিয়াল টাইমস* ১৯ জুলাই উল্লেখ করে যে বিচারে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি হতে পারে। ইয়াহিয়ার বরাত দিয়ে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে বঙ্গবন্ধু কেবল একজন পাকিস্তানি আইনজীবী রাখতে পারবেন। মূলত আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ব্রিটিশ আইনজীবী (টমাস উইলিয়ামস) সফলভাবে মামলা পরিচালনা করায় এবার পাকিস্তানের সামরিক সরকার সেই সুযোগ দেয়নি বলে পত্রিকাটি মন্তব্য করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু পত্রিকা দেশের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধ ও সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা তুলে ধরে। যেমন– *সানডে টেলিগ্রাফ* ২৫ জুলাই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে “শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ” স্লোগানের কথা উল্লেখ করে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো সুশীল সমাজের মনোভাব উপজীব্য করে

প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪.৫ সশস্ত্র প্রতিরোধ

২৫ মার্চের পর অধিকাংশ ব্রিটিশ পত্রিকা বাঙালি প্রতিরোধ সংগ্রামের অবসান হয়েছে বলে উল্লেখ করে। অর্থাৎ পরবর্তীতে যে একটি সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হবে সে সম্পর্কে ব্রিটিশ সংবাদপত্রের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। *ডেইলি টেলিগ্রাম*, ৩০ মার্চ প্রকাশিত প্রতিবেদনে সশস্ত্র প্রতিরোধের কারণ ব্যাখ্যা করে বলে যদিও ইয়াহিয়া একাধিকবার তার বক্তৃতা বিবৃতিতে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছে। কিন্তু বাস্তবে বৈধ অবৈধ কোনো ধরনের নির্বাচনে ফলাফল গ্রহণ করার কোনো পরিকল্পনা ইয়াহিয়া খানের ছিল না।[৪৯] এরই ধারাবাহিকতায় পত্রিকাটি তাদের ২ এপ্রিলের প্রতিবেদনে ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বাঙালির অসংগঠিত এবং বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করে। পত্রিকাটির মতে এটি ছিল স্বাভাবিক কারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর কোনো ধরনের সামরিক প্রস্তুতি ছিল না। *ডেইলি টেলিগ্রাফ* আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, ইয়াহিয়া খান যে সামরিক বাহিনীকে তাদের নিজেদের দেশের জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছে তারা শীঘ্রই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এতে করে রক্তপাত বন্ধ হবে বরং সহিংসতা এবং রক্তপাত আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[৫০]

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষত ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ঢাকায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকার বাইরে অন্যান্য স্থানেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শুরু থেকেই ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে একটি দীর্ঘ গেরিলা যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকা ২ এপ্রিল প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে পূর্ব পাকিস্তানে পূর্বাঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও দীর্ঘ বন বা পাহাড়ি এলাকা নেই। কিন্তু এর গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা বছরের সম্পূর্ণটাই পানিতে ডুবে থাকে এবং জুন মাসের শুরু থেকে যে বর্ষাকাল আরম্ভ হয় সে সময় পানির উচ্চতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে রাস্তাঘাট তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে সাধারণ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় এবং সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের যে ভৌগোলিক অবস্থান সেটি এ অঞ্চলকে গেরিলা যুদ্ধের একটি আদর্শ ক্ষেত্র পরিণত করেছে।[৫১] কিছু কিছু ব্রিটিশ পত্রিকা এপ্রিলের শুরু থেকেই এই সংঘাতকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করে। *টাইমস* পত্রিকা ৩ এপ্রিল সম্পাদকীয় কলামে উল্লেখ করে যে, যদিও পাকিস্তান সরকার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এবং পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর কাছে প্রধান প্রধান শহরের বাইরে বিশাল গ্রামীণ এলাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ছিল না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলাশহর এবং বিশাল গ্রামীণ এলাকা স্থানীয়দের হাতে থাকবে বলেই পত্রিকাটি মন্তব্য করে।[৫২]

এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় *সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট*-এর ২ এপ্রিলের প্রতিবেদনে। পত্রিকাটি দীর্ঘমেয়াদি গৃহযুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করে যে, শেখ মুজিবকে আজ পরাজিত মনে হলেও ইয়াহিয়া প্রকৃতপক্ষে গৃহযুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন, যে যুদ্ধে তিনি কখনো জয়ী হতে পারবেন না। বিদেশি সাংবাদিকদের তথ্যের ভিত্তিতে পত্রিকাটি স্বীকার করে যে, আপাতভাবে ঢাকায় সেনাবাহিনী পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেও এটি ইয়াহিয়ার সমস্যার সূত্রপাত মাত্র। কারণ নদীবিধৌত পূর্ব পাকিস্তানের সামরিকবাহিনীর পক্ষে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এই ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ নিয়মিত বাহিনী অপছন্দ করলেও তা গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ বলে পত্রিকাটি মন্তব্য করে। *ইকোনোমিস্ট* এর মতে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদ সরবরাহে ইয়াহিয়া সমস্যা মোকাবিলা করবেন।[৫৩]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। বিষয়টির স্বীকৃতি পাওয়া যায় গার্ডিয়ানের ৪ এপ্রিলের প্রতিবেদনে। পত্রিকাটি ঘোষণা করে যে, বিশ শতকে এমন কোনো মুক্তি সংগ্রাম পাওয়া যায় না যেটি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সর্বসম্মত সমর্থন পেয়েছে যেখানে তাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ ছিল না।[৫৪] ২৫ মার্চের পর অনেক ব্রিটিশ সাংবাদিক প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন যা পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। যেমন সাংবাদিক পিটার হ্যাজেলহার্স্ট এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলা ঘুরে বেড়ান এবং তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে *টাইমস* পত্রিকায় ১০ এপ্রিল “The Limits of Tower” শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যশোর অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ তুলে প্রতিবেদক উল্লেখ করেন যে, মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ কম এবং তা ক্রমশ ফুরিয়ে আসলেও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ঢাকার বাইরে তার প্রভাব তৈরি করা সম্ভবপর হবে না। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রতিটি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ ফলে পুলিশ প্রশাসনের সকলেই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন এবং সরকারি চাকরিজীবী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে গ্রামীণ অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী গঠিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রমের বিবরণ দিতে গিয়ে একাধিক মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার উদ্ধৃত করা হয়। তবে প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয় যে এপ্রিলের ১০ তারিখ পর্যন্ত কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা নির্দেশনায় যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি।[৫৫]

কিছু কিছু প্রতিবেদনে বাঙালির যুদ্ধ প্রচেষ্টার শক্তিশালী দিক ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষ করে মহান মুক্তিযুদ্ধ যে একটি জনযুদ্ধ ছিল এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার বাঙালি নিজ নিজ অবস্থান থেকে এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সত্যটি এসব প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। *সানডে টাইমস* ১১ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে দিনাজপুর অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেভাবে খাবার ও আশ্রয় দিয়ে বাঙালির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে তা ইতিহাসে আর কোনো সৈনিক পায়নি। পাশাপাশি পত্রিকাটি এটি উল্লেখ করে যে, বাঙালির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সামরিকবাহিনীর মতো প্রশিক্ষণের অভাব এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের স্বল্পতা।[৫৬] ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো দেখানোর চেষ্টা করে যে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি দীর্ঘ

প্রেক্ষাপট রয়েছে এবং পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক আদর্শের বাইরে গিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে। বিষয়টিকে গঠনমূলকভাবে *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকা ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উপস্থাপন করে। প্রতিবেদনে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধকে পাকিস্তান ভাবাদর্শের একটি বিরুদ্ধ চেতনা হিসেবে সমর্থন করে বলা হয়, "Given the long history of Bengali separatism, from the language and anti constitution movements of the early fifties until today, it should not have been so surprising. Loyalty became more important than ideology."[৫৭]

একই ধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় সানডে টেলিগ্রাফের ১৬ এপ্রিলের প্রতিবেদনে। প্রতিবেদক ডেভিড লোসাক সিলেট অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন আপাতভাবে আধিপত্য তৈরি করলেও পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় প্রভাব তৈরি করা সম্ভব হবে না। কারণ মৌসুমি বৃষ্টিপাত একদিকে যেমন পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচল দুরূহ করে তুলবে, তেমনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতাও তাদের মোকাবিলা করতে হবে।[৫৮] পত্রিকাটি ১৬ এপ্রিল সায়মন ড্রিং-এর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি কিছুটা সমালোচনামূলকভাবে পাওয়া যায়। ড্রিং উল্লেখ করেন সংগঠিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে বাঙালিরা কোনো প্রতিরোধই তৈরি করতে পারেনি। তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ব বাংলা ভৌগোলিকভাবেই গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হলেও যথাযথ নেতৃত্ব এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহ না থাকলে বাঙালিদের পক্ষে ইতিবাচক কোনো ফলাফল আশা করা যায় না। প্রতিবেদক ড্রিং এর মতে বাঙালি সশস্ত্র প্রতিরোধ তৈরি করতে পারলেও তাদের দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে। তার মতে এই প্রতিরোধ মুজিব বা তার অনুসারী মধ্যপন্থি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সম্ভব নয় বরং চীনপন্থি বামদের মাধ্যমে এই প্রতিরোধ হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে।[৫৯]

একই বিষয়বস্তুর ওপর প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে *অবজারভার* ১৮ এপ্রিল যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেখানে কিছুটা ভিন্নমতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। পত্রিকাটি পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে বাঙালির প্রতিরোধ সংগ্রামের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি ও পরিধি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। প্রতিবেদক কলিন স্মিথ ঢাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে এবং বামদের নেতৃত্বে ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সহযোগিতায় যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা ঘটবে যা হবে একটি ধ্রুপদি গেরিলা যুদ্ধ।[৬০] একই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে *সানডে টাইমস* পত্রিকার ১৮ এপ্রিলের প্রতিবেদনে। পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে ইয়াহিয়ার গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় মাওবাদী বা নকশালপন্থিদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে যেখানে মুজিব ছিলেন অনেক বেশি মধ্যপন্থি ও যৌক্তিক।[৬১]

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে যুদ্ধ কৌশলের দিকটি তুলে ধরে। ভারত যে তার ভূখণ্ড ব্যবহার করে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণে ভূমিকা পালন করছিল তা মোটামুটি সবারই জানা ছিল। বিষয়টি ডেইলি টেলিগ্রাফের ৯ জুলাইয়ের প্রতিবেদনে উঠে আসে। প্রতিবেদক ক্লার হলিনগ্রোথ বেনাপোল সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন

শেষে উল্লেখ করেন যে ভারতের সীমান্তের ভেতরে বাংলাদেশ গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের সহায়তা করেছে। প্রতিবেদক উল্লেখ করেন ভারতীয় সীমান্তের কাছ থেকে নিয়মিত গুলিবর্ষণ করা হত যেন পাকিস্তানি বাহিনী সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের সৈন্য সরাতে না পারে। এছাড়া বাঙালি গেরিলারা রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর টহলকৃত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করত যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মাইন ও বোমা পেতে রাখা, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক তার কেটে যোগাযোগ বিঘ্ন ঘটানো ইত্যাদি।[৬২] একইদিন অপর একটি প্রতিবেদনে সীমান্তবর্তী যেসব গ্রামে বাঙালি গেরিলারা লুকিয়ে থাকতে পারে বলে পাকিস্তানি বাহিনী ধারণা করছে সেখানে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে অভিযান চালানোর কথা সীমন্ত পার হয়ে ভারতে আসা শরণার্থীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে পত্রিকাটি উপস্থাপন করে। এ সময় অনেক শরণার্থী বাঙালি গেরিলাদের সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কথা স্বীকার করে।[৬৩] জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধের তীব্রতা এবং গেরিলা তৎপরতার বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো এ সময় প্রায় প্রতিদিনই বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *সানডে টাইমস* পত্রিকাটির মতে গেরিলারা হালকা অস্ত্র ব্যবহার করলেও তারা আত্মবিশ্বাসী এবং কৌশলী। পত্রিকাটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে খুলনা ও মংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতি হওয়ার কথা উল্লেখ করে।[৬৪]

বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধের বিবরণ দিতে গিয়ে *ইকোনোমিস্ট* তাদের ৩১ জুলাইয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, পাকিস্তানি বাহিনীর পাশাপাশি রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যরাও গেরিলাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। পাশাপাশি এটিও উল্লেখ করা হয় যে, মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানি বাহিনীর চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্য রাস্তা ও ব্রিজ ধ্বংস করেছে, অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে এবং কারখানা পরিচালনা করার জন্য কোনো শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না।[৬৫] মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী আরো ভীতি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। *সানডে টেলিগ্রাফ* এ পরিপ্রেক্ষিতে ১ আগস্ট উল্লেখ করে যে ইয়াহিয়া ঢাকায় এসে বাঙালি গেরিলাদের বিপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কর্মসূচি উদ্বোধন করবেন। এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয় যে বাঙালি জনগোষ্ঠী যেনো তাদের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন থাকেন সে জন্য এটি করা হবে।[৬৬] অক্টোবর মাসে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে তা ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনে উঠে আসে। *ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকা অক্টোবরের ৮ তারিখে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গেরিলাদের সাথে তুলনা করে উল্লেখ করে যে মুক্তিবাহিনী সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে থাকলেও তারা গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।[৬৭] *গার্ডিয়ান* ৩ নভেম্বর উল্লেখ করে যে বিগত কয়েক সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গেরিলাদের এ ধরনের সাফল্য ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে পাকিস্তানকে সন্দিহান করে তোলে এবং সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে পাকিস্তানের গোলা বর্ষণ বৃদ্ধি পায়।[৬৮] মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে একই দিন *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায়ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদক ক্লারহলিন গ্রোথ ঢাকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে এই

প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশি গেরিলা পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করছে যারা পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, মার্চে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের আগ্রাসন শুরু করার পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকার রাস্তায় গেরিলাদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে এবং ব্যাংক, নির্বাচন কমিশন ভবন, টেলিভিশন ভবন, পেট্রোল পাম্পসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় গেরিলারা তাদের তৎপরতা চালিয়েছে।[৬৯] এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ভারতের বিমানবাহিনীর অভিযানের ওপর ভিত্তি করে *টাইমস* পত্রিকায় ৭ ডিসেম্বর অপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ঢাকার অনেক অধিবাসী তাদের বাসার ছাদে উঠে এই বিমান আক্রমণ দেখেন। এছাড়া ঢাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসের ও জাতিসংঘের কর্মকর্তা এবং বিদেশি সাংবাদিকবৃন্দ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছিলেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় তারা মোমের আলোতে প্রতিবেদন তৈরি করেন।[৭০] ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। এসব প্রতিবেদনের মধ্যে *ডেইলি মিরর* পত্রিকার ৭ ডিসেম্বরের প্রতিবেদন বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে। পত্রিকাটি ১৯৭১ সালের জুন মাসে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিবেদন প্রকাশ করে, “Death of a Nation” শিরোনামে, যেখানে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে জন্মের আগেই বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে কারণ এই দুই মাসেই প্রায় পাঁচ লক্ষ বাঙালি নিহত এবং সত্তর লক্ষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদক জনপিলগার তার আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে ৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করেন “I now repeat the birth of a nation, Bangladesh.”[৭১]

৪.৬ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শুরু থেকেই বাংলাদেশ সংকটের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান এবং এর সম্ভাব্যতা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *টাইমস* পত্রিকা ৩ এপ্রিল উল্লেখ করে যে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর পক্ষে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আধিপত্য ধরে রাখা সম্ভবপর ছিল না। পত্রিকাটি সংকট নিরসনে আলোচনার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানায়।[৭২] সাপ্তাহিক ইকোনমিস্টের ৩ এপ্রিলের প্রতিবেদনে “Unity at Gunpoint” শিরোনামে উল্লেখ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে যেকোনো রাজনৈতিক সমাধান যেমন গ্রহণযোগ্যতা হারাবে তেমনি নতুন নির্বাচন আয়োজন করা হলেও স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছাড়া অন্য কোনো দলে পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাটি উল্লেখ করে যে, পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না কারণ পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ সামরিক শাসনের বিপক্ষে অসহযোগিতামূলক নীতি গ্রহণ করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকাটি একটি রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে মার্চ মাসে মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে সংঘটিত আলোচনার উদাহরণ তুলে ধরে। পত্রিকাটির মতে আলোচনায় ৬ দফার মূল বিষয়বস্তু কখনোই উঠে আসেনি এবং এটি অবধারিতভাবে ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে কোনো না কোনো পর্যায়ে বিভক্তি তৈরি

করত। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিতভাবে ভারতের সাথে বাণিজ্যের সুযোগ করে দিত। ইকোনোমিস্টের মতে ইয়াহিয়া মার্চ মাসে আলোচনায় কোনোকিছু অর্জন না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ফলশ্রুতিতে বাঙালির ওপর সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।[৭৩] পত্রিকাগুলো এ সময় একটি রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে পাকিস্তানে সব ধরনের বৈদেশিক সহায়তা বন্ধের ওপর জোর দেয়। *গার্ডিয়ান* পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল "A Cry for Help" শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ মতের প্রতিফলন পাওয়া যায়। *সানডে টাইমস* পত্রিকায় ১৮ এপ্রিলের প্রতিবেদনেও একই ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়। পত্রিকাটির মতে ব্রিটেন ও অন্যান্য পরাশক্তির উচিত তাদের নিজস্ব কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে পাকিস্তানের ওপর একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে চাপ তৈরি করা।[৭৪]

একইভাবে *গার্ডিয়ান* ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, আপাতভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আধিপত্য দেখালেও ইয়াহিয়াকে একটি বৃহৎ পরিমণ্ডলের সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনায় চাপ প্রয়োগ করা উচিত। *গার্ডিয়ান* এ প্রেক্ষাপটে সতর্ক করে যে ইসলামাবাদের সাথে সম্পর্ক আছে এমন দলগুলো রাজনৈতিক সমাধানের ক্ষেত্রে বাঙালি জনগণের সমর্থন পাবে না। একইভাবে আমেরিকাপন্থি মুজিব ও আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে ভাসানী ন্যাপের বিপ্লবী গেরিলাদের হাতেই চীনা অস্ত্র থাকা সম্ভাবনা তৈরি হবে। আপাতভাবে ইয়াহিয়া ভুট্টোর সমর্থন পেলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতা থেকে দূরে থাকলে তিনিও সমর্থন প্রত্যাহার করবেন কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। এছাড়া এরকম পরিস্থিতিতে বিশ্ব ব্যাংকও ইসলামাবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। পত্রিকাটির মতে ইয়াহিয়া মনে করছেন হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব কিন্তু বাস্তবে এর উলটো হবে। এসব যুক্তির ভিত্তিতে *গার্ডিয়ান* তার সম্পাদকীয়তে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে অবস্থান তুলে ধরে প্রভাবশালী এবং বুদ্ধিমান পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে আবেদন করে যে তারা চাইলে এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে পারেন।[৭৫]

একটি পর্যায়ে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো পূর্ব পাকিস্তান নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে "স্বাধীন বাংলাদেশ" নামটি ব্যবহার করতে থাকে। *সানডে টেলিগ্রাম* পত্রিকায় ২৫ জুলাইয়ের প্রতিবেদনে এমনটি দেখা যায়। এমনকি পত্রিকাটি কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রতিবেদন তৈরি করে।[৭৬] এপ্রিল ও মে মাসে পত্রিকাগুলো বৃহৎ শক্তির পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারেরও সমালোচনা করে। বিশেষ করে সক্রিয় কূটনৈতিক উদ্যোগের পরিবর্তে কেবল বিবৃতি প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকায় *গার্ডিয়ান* ১৩ মে "The Silent Consequence" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে স্যার ডগলাস হিউমের সমালোচনা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টিতে ব্রিটেনের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করে মন্তব্য করে: "What Parliament decides may matter a bit. How many MPs turn up to debate may matter. How Britain reacts through the next six months will certainly have a profound effect on west Pakistani opinion and it is this West

Pakistani opinion which could yet see the sad doings of past two months undone."[৭৭]

শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি অনেক পত্রিকা বিপক্ষেও মত দেয় এই বলে যে, অন্য কোনো আপসের সুযোগ বাংলাদেশের সামনে নেই। *স্টেটসম্যান* পত্রিকা তাদের ১০ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, জিন্নাহর সৃষ্টি করা পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছে এবং এজন্য ইয়াহিয়া ও তার জেনারেলদের অবিবেচক কর্মকাণ্ড দায়ী। পত্রিকাটির মতে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের সর্বশেষ সুযোগটি ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালির বিপক্ষে সামরিক অভিযান এবং এর প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে কোনো সমাধানের পথ বন্ধ হয়ে গেছে।[৭৮] একই ধরনের মত প্রকাশ করে *ডেইলি মিরর* তাদের ৪ ডিসেম্বরের প্রতিবেদনে। পত্রিকাটি যেকোনো রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ইয়াহিয়া খান নিজেই নষ্ট করেছেন অভিযোগ করে মন্তব্য করে, "Let us get our recent history correct. In March, Field Marshal Yahya Khan and his generals crushed the democratically elected Government of East Pakistan, now Bangladesh."[৭৯]

৪.৭ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো বাংলাদেশ সংকটের শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে মানবিক দিক বিবেচনায় গঠনমূলক ভূমিকা রাখার আবেদন জানায়। অধিকাংশ পত্রিকার মতে ইয়াহিয়া খান নৈতিকতা ও মহানুভবতাকে উপেক্ষা করে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত চাপ প্রয়োগ করে তাকে থামানো। যেমন– *গার্ডিয়ান* তাদের ৩১ মার্চের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে যে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করলেও তাদের বিবেচনা করা উচিত এই অস্ত্র কি কাজে ব্যবহৃত হবে। চীন এবং সিলন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও অস্ত্র পরিবহণে সহায়তা করলেও দেশ দুটোর উপলব্ধি করা উচিত যে এসব সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে কি উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। *গার্ডিয়ান* মনে করে যে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটেনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এবং ব্রিটিশ সরকারের উচিত এই প্রভাবকে সংকট নিরসনে গঠনমূলক, উন্মুক্ত এবং প্রবলভাবে প্রয়োগ করা।[৮০] এপ্রিলের শুরু থেকেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে যাওয়া বাংলাদেশের শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি একদিকে যেমন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করে তেমনি একই সাথে জাতিগতভাবে মিল থাকায় বাংলাদেশের বাঙালি নিধনের বিপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের ভেতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিষয়টি *ডেইলি টেলিগ্রাফ* তাদের ২ এপ্রিলের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে। পত্রিকাটি আশঙ্কা প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গে এই অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।[৮১]

প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ভারতের। অধিকাংশ ব্রিটিশ পত্রিকাই বিষয়টিকে সামনে রেখে

এপ্রিলের শুরু থেকে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। *ইকোনোমিস্ট* তাদের ৩ এপ্রিলের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রকৃতি, ধরন ও সময়কাল নিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাটি উল্লেখ করে ভারতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে বাঙালি নিধনের বিপক্ষে প্রস্তাব পাশ করা হলেও ভারতের সাধারণ জনগণ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আরো নিবিড়ভাবে বাংলাদেশ সংকটে জড়িত হওয়ার পক্ষপাতী। তবে এই চাপের বাইরে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী তার কথায় ও কাজে আরো সতর্ক থাকার পক্ষপাতী ছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে ভারতের আনুষ্ঠানিক সমর্থনের কথা প্রকাশিত হলে বাঙালি নিধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। পত্রিকাটি একই প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধে চীনের সম্ভাব্য ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। ইকোনমিস্টের মতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চীনকে তার জাতীয় স্বার্থ এবং আদর্শের মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নেওয়ার একটি জটিল সমীকরণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পত্রিকাটির মতে এ পরিস্থিতিতে চীন সামগ্রিক পরিস্থিতি উপেক্ষা করার নীতি গ্রহণ করবে। পত্রিকাটি গঠনমূলকভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয় এবং মন্তব্য করে যে, বৃহৎ শক্তির উচিত একটি সমাধান অযোগ্য গেরিলা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগেই বাঙালির সাথে আলোচনায় বসতে ইয়াহিয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করা।[৮২]

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরির ক্ষেত্র ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর গঠনমূলক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। সাপ্তাহিক *গার্ডিয়ান* ৪ এপ্রিল সাংবাদিক মার্টিন উলকাটের প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সেখানে উল্লেখ করা হয় যে মাগুরা, যশোর, ফরিদপুরসহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ এলাকার মানুষ মনে করছেন যে দেরি হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত হস্তক্ষেপ করা। *গার্ডিয়ান* মনে করে এই সংঘাতের ফলে প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানে সব ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধ করা।[৮৩] তবে সাংবাদিক নিকোলাস টমালিন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে দিনাজপুর এলাকা ভ্রমণ করে উল্লেখ করেন যে অন্ততপক্ষে ওই সময় পর্যন্ত ভারতের অস্ত্র ও সামরিক সহায়তার কোনো প্রমাণ তিনি পাননি।[৮৪] একই ধরনের তথ্য *টেলিগ্রাফ* তাদের ১৬ এপ্রিলের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। প্রতিবেদক ডেভিড লোসাক সিলেট ও আসাম সীমান্তবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন শেষে পাকিস্তানের অভিযোগ অস্বীকার করে পূর্ব বাংলা ও ভারতের সীমান্ত বন্ধ থাকার কথা উল্লেখ করেন।[৮৫] অনেক ব্রিটিশ পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকার ১৬ এপ্রিলের প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা যায়। পত্রিকাটি জাতিসংঘ সনদের আত্মনিয়ন্ত্রণ আধিকারের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করে যে, পূর্ব বাংলার কার্যকলাপের কোনো ভুল খুঁজে পাওয়া কিংবা বৃহৎ শক্তিগুলোর পূর্ব বাংলাকে অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। পত্রিকাটি এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করে, যদিও ব্রিটেনের সামনে সুযোগ রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করার কিন্তু বিষয়টি তাদের বিবেচনা করা উচিত।

পত্রিকাটি বাংলাদেশ ইস্যুতে চীনের ভূমিকারও সমালোচনা করে। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থিদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয় যে, চীন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কারণ পূর্ব বাংলার সাথে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এসব আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার পরও পাকিস্তানের ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী বলে পত্রিকাটি জানায়।[৮৬] এ পরিপ্রেক্ষিতে *সানডে টাইমস* পত্রিকা তাদের ১৮ জুলাই এর প্রতিবেদনে ব্রিটেনের ভূমিকার সমালোচনা করে। ব্রিটেন বাংলাদেশ সংকটকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে উল্লেখ করলে পত্রিকাটি ঘোষণা করে যে, আইনের শাসন ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না। *সানডে টাইমস* জানায় ব্রিটিশ সরকারের উচিত পূর্ব পাকিস্তানের সংঘটিত ঘটনাবলির ওপর তার অসন্তোষ আরো তীব্র ভাষায় প্রকাশ করা। পাশাপাশি সংকট নিরসনে ব্রিটেন অনেক বেশি প্রথাগত কিন্তু নিরাপদ কূটনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগে সব ধরনের বিদেশি সহায়তা বন্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হয় প্রতিবেদনে।[৮৭] ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকেও সংকট সমাধানে যুক্ত করার পক্ষে মতামত প্রদান করে। উদাহরণ হিসেবে ডেইলি টেলিগ্রাফের ৯ জুলাইয়ের প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে পত্রিকাটি সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়নের পক্ষে অবস্থান নেয়।[৮৮]

অনেক পত্রিকা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা কে তৎকালীন স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে। এরকম একটি গঠনমূলক প্রতিবেদন *নিউ স্টেটসম্যান* পত্রিকায় ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে ভারতের ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মন্তব্য করা হয় যে ভারত আপাতভাবে শরণার্থী সংকট এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রক্ষণাত্মক কৌশল গ্রহণ করলেও ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি করতে পারে যা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রিটিশ পত্রিকার মতোই *নিউ স্টেটসম্যান* জানায় আন্তর্জাতিকভাবে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা বন্ধ করা সম্ভব হলে তা ইসলামাবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করবে।[৮৯]

নভেম্বরের শুরু থেকে গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো বহির্বিশ্ব ও বিশেষত ভারতের ভূমিকাকে নতুন করে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে *গার্ডিয়ান* ৩ নভেম্বর উল্লেখ করে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় গেরিলাদের জন্য ভারতের অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সোভিয়েত অস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সাফল্যের পেছনে পত্রিকাটি ভারতের সাথে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করে যে, ৬ মাস হোক বা ৬ বছর মুক্তিবাহিনীর বিজয় অর্জিত হবেই। ভারতের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে পত্রিকাটি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতের মাটিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এবং ইন্ডিয়ান রেসক্রস ও অক্সফাম-এর মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে।[৯০]

৫. উপসংহার

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো প্রথম থেকেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংকটে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে প্রায় সব পত্রিকার ভূমিকা ছিলো হত্যা ও নির্যাতনের বিপক্ষে এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। তবে হত্যা ও নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পত্রিকা মন্তব্য করে যে, কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক ব্রিটিশ সাংবাদিক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাদের তথ্যের ভিত্তিতে হত্যা ও নির্যাতনের একাধিক সাক্ষাৎকারভিত্তিক ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণসংবলিত প্রতিবেদন ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো শরণার্থীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে দেখানোর চেষ্টা করেছে যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সবাই পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হলেও হিন্দু জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্টভাবে হত্যার শিকার হয়।

ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনের একটি বড় অংশ দখল করে আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা, পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, ব্রিটেনসহ বহির্বিশ্বের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা, বঙ্গবন্ধুর অবস্থান এবং বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ। বিশেষত শুরু থেকেই ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো তাদের সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সংকটকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে অভিহিত করার সমালোচনা করে এবং আরও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগে জোর দেয়। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো গোপন সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আশঙ্কা প্রকাশ করে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকাগুলো সরাসরি বঙ্গবন্ধুর মুক্তিকে রাজনৈতিক সমাধান অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে।

যেসব ব্রিটিশ পত্রিকা মার্চ মাসের পর বাঙালির বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ দেখে মন্তব্য করেছিল যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে সেসব পত্রিকাই ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। পত্রিকাগুলো দেখানোর চেষ্টা করে যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৯৮ ভাগ জনগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। তারা শেখ মুজিবের মতো একজন মধ্যপন্থি রাজনীতিককে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো ইয়াহিয়া ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অভিযুক্ত করে মন্তব্য করে যে বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার জন্য ভোট না দিলেও মার্চ মাস থেকে ইয়াহিয়ার নির্দেশে সেনাবাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এর পাশাপাশি ব্রিটিশ পত্রিকাগুলো শরণার্থীদের যে দুর্ভোগ সেটিকে কোনোকিছুর সাথে তুলনা করার যোগ্য নয় বলে মন্তব্য করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামরিক শাসনের কঠোর বিধিনিষেধের কারণে সংবাদ সংগ্রহে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলেও ব্রিটিশ সংবাদপত্র ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী, মিশনারি ও দূতাবাসের নিজস্ব সংযোগ ব্যবহার করে বাঙালির ওপর পরিচালিত ইতিহাসের ভায়াবহতম গণহত্যা ও নির্যাতনের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম

হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে সাংবাদিকরা গোপনে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রিটিশ সাংবাদিকদের এই ভূমিকা দেশের বাইরে ভারতের শরণার্থী শিবিরে, জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায়, এমনকি পাকিস্তানের গোপন সামরিক আদালতেও পরিব্যাপ্ত ছিল। এইসব সংবাদপত্রের দৃঢ় ও নৈতিক ভূমিকার কারণেই ইয়াহিয়ার পক্ষে ১৯৭১ সালে গণহত্যা ও ধ্বংসাবশেষের তথ্য গোপন করা সম্ভব হয়নি এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. Sydney H. schanberg, "Consul Urges U.S. Start Evacuation In East Pakistan", *The New York times,* 31 march 1971.
২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ত্রয়োদশ খণ্ড, *বিদেশী প্রতিক্রিয়া: জাতিসংঘ ও বিভিন্ন রাষ্ট্র* (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে হাক্কানী পাবলিসার্স, ১৯৮২), ২।
৩. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র* (ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৩), ৬৩।
৪. ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ*, ৭৩-৭৮।
৫. Enayetur Rahim and Joyee L. Rahim, *UK Foreign & Commonwealth Office De-Classified Documents 1962-1971* (Dhaka: Hakkani Publishers, 2013), 151.
৬. Rahim and Rahim, *UK Foreign & Commonwealth,* 152.
৭. Rahim and Rahim, 95.
৮. ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ*, ১৩৬-১৬৬।
৯. ভাট্টি, ১৬৮-১৭১।
১০. ভাট্টি, ১৯৩।
১১. Malcolm W. Browne, "Pakistani General Disputes Reports of Casualties", *The New York Times,* 7 May 1971.
১২. Malcolm W. Browne, "Yahya Again Says Aim Is Civil rule", *The New York Times,* 25 May 1971.
১৩. "Correspondent of The Times Ousted From East Pakistan", *The New York Times,* 1 July 1971.
১৪. Simon Dring, "Tanks Crush Revolt in Pakistan", *Daily Telegraph,* 30 March 1971.
১৫. Dring, "Tanks Crush", *Daily Telegraph,* 30 March 1971.
১৬. Dring, "Tanks Crush", *Daily Telegraph,* 30 March 1971.
১৭. "A Massacre In Pakistan", *Guardian,* 31 March 1971.
১৮. Mervyin Jones, "Weep For Bengal", *New Statesman,* 2 April 1971.
১৯. "The Slaughter in East Pakistan" *The Times,* 3 April 1971.
২০. "Unity At Gunpoint", *Economist,* 3 April 1971.
২১. "Pakistan's Path to Bloodshed", *Telegraph,* 4 April 1971.

২২. “Pakistan’s Path”, *Telegraph,* 4 April 1971.
২৩. Colin Smith, “The Fading Dream of Bangladesh”, *Observer,* 18 April 1971.
২৪. Bengal Tragedy, *The Daily Telegraph,* 2 April 1971.
২৫. Martin Woollacott, “A Cry For Help”, *Guardian,* 4 April 1971.
২৬. Nicholas Tomalin, “Murder Has Been Arranged After Dacca, Jessore, Chittagong…”, *Sunday Times,* 11 April 1971.
২৭. Tomalin, “Murder Has Been Arranged”, *Sunday Times,* 11 April 1971.
২৮. “The Blood of Bangladesh”, *New Statesman,* 16 April 1971.
২৯. Colin Smith, “The Fading Dream of Bangladesh”, *Observer,* 18 April 1971.
৩০. Smith, “The Fading Dream”, *Observer,* 18 April 1971.
৩১. “Pakistan: A Time to Speak Out”, *Sunday Times,* 18 April 1971.
৩২. Smith, “The Fading Dream”, *Observer,* 18 April 1971.
৩৩. Peter Hazelhurst, “Unbelievable Missery”, *The Times,* 15 May 1971.
৩৪. Anthony Mascarenhas, “Genocide”, *Sunday Times,* 13 June 1971.
৩৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, চতুর্দশ খণ্ড, *বিশ্ব জনমত* (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে হাক্কানী পাবলিসার্স, ১৯৮২), ৩৭৬।
৩৬. Mascarenhas, “Genocide”, *Sunday Times,* 13 June 1971.
৩৭. Marray Sayle, “A Regime of Thugs and Bigots”, *Sunday Times,* 11 July 1971.
৩৮. “Time is Running Out in Bengal”, *Economist,* 31 July 1971.
৩৯. “The War That Threatents The World”, *Daily Mirror,* 4 December 1971.
৪০. Dring, “Tanks Crush”, *Daily Telegraph,* 30 March 1971.
৪১. Marvyin Jones, “Weep for Bengali”, *New Statesman,* 2 April 1971.
৪২. Martin Woollacott, “A Cry for Help”, *Guardian,* 11 April 1971.
৪৩. “The World’s Latest Refugees”, *Guardian,* 7 May 1971.
৪৪. Peter Hazelhurst, “The limts of Tower”, *The Times,* 10 April 1971.
৪৫. Hazelhurst, “Unbelievable”, *The Times,* 15 May 1971.
৪৬. “Time is Running”, *Economist,* 31 July 1971.
৪৭. “The War That Threatents”, *Daily Mirror,* 4 December 1971.
৪৮. Dring, “Tanks Crush”, 30 March 1971.
৪৯. Dring, “Tanks Crush”, *Daily Telegraph,* 30 March 1971.
৫০. “Bengal Tragedy”, *Daily Telegraph,* 2 April 1971.
৫১. MervyanJones, “Weep For Bengal”, *New Statesman,* 2 April 1971.
৫২. “The Slaughter in East Pakistan”, *The Times,* 3 April 1971.
৫৩. “Unity at Gunpoint”, *Economist,* 3 April 1971.
৫৪. “Martin Wollacott”, “A Cry for Hepl”, *Guardian,* 4 April 1971.
৫৫. Hazelhurst, “The limts”, *The Times,* 10 April 1971.
৫৬. Tomalin, “Murder Has Been Arranged” *Sunday Times,* 11 April 1971.
৫৭. “The Blood”, *New Statesman,* 16 April 1971.

৫৮. David Loshak, "Slaughter Goes on as E.Pakistan Fights for Life", *Sunday Telegraph*, 16 April 1971.
৫৯. Simon Dring, "Sheikh's Supporters Failed to Prepare for Armed", *Sunday Telegraph*, 16 April 1971.
৬০. Smith, "The Fading Dream", *Observer*, 18 April 1971.
৬১. "Pakistan: A Time to Speak Out", *Sunday Times*, 18 April 1971.
৬২. Clare Hellingworth, "War Spirit Grows On Trigger –Happy Pakistan Border", *Daily Telegraph*, 9 July 1971.
৬৩. Peter Gill, "Indian State Swamped By Refugees", *Telegraph*, 9 July 1971.
৬৪. Sayle, "A Regime of Thugs", *Sunday Times*, 11 July 1971.
৬৫. "Time is Running", *Economist*, 31 July 1971.
৬৬. Care Aollingworth, "Yahyah To Visit Dacca", *Sunday Telegraph*, 1 August 1971.
৬৭. "India Faces New Flow of Refugees", *Evening Standard*, 8 October 1971.
৬৮. Jim Hoagland, "Guerrillas Set A 12-Month Target", *Guardian*, 3 November 1971.
৬৯. Clare Hollingworth, "Guerrillas Start Street Warfare in East Pakistan," *Daily Telegraph*, 3 November 1971.
৭০. James P. Sterba, "Dacca Eats by Candlelight After Day of Strightfight", *The Times*, 7 December 1971.
৭১. John Pilger, "Alive and Free," *Daily Mirror*, 7 December 1971.
৭২. "The Slaughter in East Pakistan" *The Times*, 3 April 1971.
৭৩. "Unity At Gunpoint," *Economist*, 3 April 1971.
৭৪. "Pakistan: A Time to Speak Out" *Sunday Times*, 18 April 1971.
৭৫. "Rhetoric and Reality," *Guardian*, 14 April 1971.
৭৬. "Still No End to Bengal Flight," *Sunday Telegraph*, 25 July 1971.
৭৭. "The Silent Consequence", *Guardian*, 13 May 1971.
৭৮. Peter Shore, "Bangladesh Must Be Freed", *New Statesman*, 10 September 1971.
৭৯. "The War That That Threatents The World", *Daily Mirror*, 4 December 1971.
৮০. "A Massacre In Pakistan", *Guardian*, 31 March 1971.
৮১. Bengal Tragedy, *Daily Telegraph*, 2 April 1971.
৮২. "Unity At Gunpoint," *Economist*, 3 April 1971.
৮৩. Woollacott, "A Cry For Help", *Guardian*, 4 April 1971.
৮৪. Tomalin, "Murder Has Been Arranged", *Sunday Times*, 11 April 1971.
৮৫. David Loshak, "Slaughter Goes On As E. Pakistan Fights For Life", *Daily Telegraph*, 16 April 1971.
৮৬. "The Blood of Bangladesh", *New Statesman*, 16 April 1971.

৮৭. "Pakistan : A Time to Speak Out," *Sunday Times*, 18 April 1971.
৮৮. Clare Hellingworth, "War Spirit Grows On Trigger–Happy Pakistan Border," *Daily Telegraph*, 9 July 1971.
৮৯. Peter Shore, "Bangladesh Must Be Freed", *New Statesman*, 10 September 1971.
৯০. Jim Hoagland, "Guerrillas Set A 12-Month Target", *Guardian*, 3 November 1971.